শতবার্ষিক স্মরণ

সত্যজিৎ রায় : পথ নির্মাণের পাঁচালি

শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী

ধীরে ধীরে জুম করছে ক্যামেরা। স্পষ্ট হচ্ছে একটা ফ্রেম। বিবর্ণ ধূসর এক আবছা স্মৃতির পাতা যেন খুলে যাচ্ছে সামনে। পুরনো কলকাতা। প্রাসাদের মতো বড় একটা বাড়ি। তার দোতলায় একখানা ঘর। জানালা দিয়ে গড়িয়ে নামছে দিনের বিমর্ষ আলো, সেই আলো এসে পড়েছে ঝকঝকে পাথরের মেঝেতে। মেঝেতে রাখা একটা ঝুড়ি। ঝুড়ি থেকে ছবিছাপার এক-একটি ব্লক বের করে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখছেন বিধুমুখী। বয়স তাঁর যত না, আজকাল তাঁকে দেখলে মনে হয় তার থেকে অনেক বেশি। হাত আর চলছে না তাঁর, জলে ভরে আসছে চোখ। এতবড় বাড়ির এতকাল তিনিই ছিলেন কর্ত্রী। নিজের এবং পরের ছেলেমেয়ে, আত্মীয় পরিজন সকলকে নিয়ে বিরাট সংসার একা হাতেই সামলেছেন দীর্ঘদিন। আজ বড় অবসন্ন তিনি, বিষণ্ণ দুচোখের দৃষ্টি, থমকে থাকা অজস্র দীর্ঘশ্বাস ঘিরে রেখেছে তাঁকে। একের পর এক মানসিক আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে ক্রমশ উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন জগৎসংসার থেকে। পাশে বসে তাঁর ছোট্ট নাতিটি। কতই বা বয়স—তিন কী চার। বড় বড় দুটি চোখে অবাক বিস্ময়ে ব্লকগুলির দিকে চেয়ে আছে। ঠাকুমা ঝেড়েমুছে তার হাতে তুলে দিলে, সেগুলি গুছিয়ে রাখছে সে। বুঝতেও পারছে না এইসব ব্লক নিয়েই একদিন ছবি ছাপানোর কী আশ্চর্য কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন তার ঠাকুরদা। ভারতবর্ষের মুদ্রণশিল্পে এনেছিলেন যথার্থই এক 'সশব্দ' বিপ্লব। বিদেশ থেকে যন্ত্র এনে, স্বদেশের শ্রেষ্ঠ ছাপাখানা বানিয়েছিলেন এই বাড়িতেই। নিজস্ব গবেষণার হাফটোন কৌশলের অভাবনীয় উন্নতি

তখন তরুণ ছিল অরুণ আলো। কেমন ছিল বালার্কের মধ্যদিনের মার্তণ্ড হয়ে ওঠার আগের ঊষাপর্ব? কেমন ছিল বিস্ময়পুরুষের বাল্য-কৈশোর-যৌবন? এ-প্রবন্ধে সেই প্রশ্নেরই উত্তর।

ঘটিয়ে বিদেশের পত্রপত্রিকায় সে-বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন দেশে বিদেশে। তারপর এল বিশ্বযুদ্ধ। বিদেশ থেকে ওষুধ আসা বন্ধ হল। বেড়ে চলল রক্তে শর্করার পরিমাণ। মাত্র বাহান্ন বছর বয়সেই চলে গেলেন তিনি।

তিনি উপেন্দ্রকিশোর, বাংলার শিশুদের রঙিন শৈশব গড়ে দেওয়ার কারিগর। ছোটদের জন্য গল্প লিখে, হাজার মজার পসরা সাজিয়ে, সন্দেশ পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করে তাদের জন্য এক বিস্ময়জগৎ বানিয়ে রেখে গেলেন।

উপেন্দ্রকিশোরের অকালমৃত্যুর পর তাঁর সেই স্বপ্ন, উদ্যম এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করবার দায়িত্ব এসে পড়েছিল জ্যেষ্ঠপুত্র সুকুমারের কাঁধে। ভালই চলছিল সব। সন্দেশ পত্রিকা শিশুদের মনের কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছিল নিয়মিত। তারপর একদিন জমিদারি দেখাশোনার কাজে গিয়ে কিছুদিন থেকে ময়মনসিংহ থেকে ফিরে এলেন সুকুমার, খাজনা দিতে ছুটে-আসা প্রজাদের সব খাজনা তাদেরকেই ফিরিয়ে দিয়ে, সঙ্গে নিয়ে এলেন প্রচণ্ড জ্বর। কালাজ্বর। মাত্র আড়াই বছরের শিশুপুত্রকে রেখে জীবনের পালা সাঙ্গ করে চলে গেলেন তিনি। এই সেই তাঁর পুত্রটি, যে ঠাকুমার সঙ্গে বসে কাঠের ব্লকগুলি তুলে রাখছে যত্নে। ভাল নাম তার সত্যজিৎ, সবাই আদর করে ডাকে মানিক। সে বুঝতেও পারছে না কোন্ সাত রাজার ধন মানিক সে তুলে রাখছে, কোন্ উত্তরাধিকার রক্ষার দায় বর্তাতে চলেছে তার ওপর। ভাবতেও পারছে না, এই বিরাট বাড়ি ছেড়ে খুব তাড়াতাড়ি চলে যেতে হবে তাকে। পাওনা আদায় না হওয়ায়, দেনার দায়ে হারিয়ে যাবে এই রূপকথার রাজ্য। এমনকী মিথ্যে অভিযোগে একদিনের জন্য জেলও খাটতে হবে তার প্রিয় 'নানকুকাকা' সুবিমল রায়কে। এই প্রেস, প্রেসের ঝমঝম শব্দ, রঙের গন্ধে ম-ম করা চারপাশ, দামি আসবাব, ঝকমকে ছাপা ছবির আশ্চর্য জগৎ, ঠাকুরদার রং-তুলি-ইজেল সব হারিয়ে যাবে, একটা ইতিহাস মুছে যাবে চিরতরে।

এবার ক্যামেরা আস্তে আস্তে ফেড আউট করছে। অবাক দৃষ্টিতে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে শিশুটি, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে সেই বাড়ি। মায়ের হাত ধরে সে চেপে বসছে একটা সেকেলে মোটর-গাড়িতে। গাড়ি এগিয়ে চলেছে। আরও ফেড আউট হচ্ছে ফ্রেম, আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে গাড়ি, পথ বেয়ে আর এক পথে এগিয়ে চলেছে সে। সেই পথে লেখা হচ্ছে অন্য এক পথের পাঁচালি।

রায়বাড়ির কথা

১০০ গড়পার রোড। ধবধবে সাদা বিরাট এক বাড়ি। সামনের দিকটায় একটু ফিকে গোলাপি ভাব, ওপরের দিকে বড় করে উঁচু উঁচু ইংরেজি হরফে লেখা 'ইউ রায় অ্যান্ড সন্স'। তার নিচে একটু ছোট হরফে 'প্রিন্টার্স অ্যান্ড ব্লক মেকার্স'। তিনতলা বাড়িটির একতলায় ছাপাখানা, দোতলায় ব্লক তৈরি আর হরফ বসানোর ঘর। পিছনদিকটায় আর তিনতলায় পরিবারের সকলকে নিয়ে থাকেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি। তিনি ছোটদের জন্য গল্প লেখেন; রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনি তাদের মতো করে শোনান। ছবি আঁকেন। সেই ছবি ছাপার পর ছোটদের মন জয় করতে পারছে না দেখে, নিজেই ছবি ছাপানোর অভিনব কৌশল আবিষ্কারে মগ্ন থাকেন। গান শোনেন, বেহালা বাজান, আর সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন ছোটদের মন ও মগজের এক আশ্চর্য রসদ 'সন্দেশ'। সে-পত্রিকার পাতায় পাতায় ছয়লাপ হয়ে থাকে বিস্ময় আর মজার সম্ভার—বিজ্ঞানের সরস আলোচনা, ছড়া, গল্প। তাঁর নিজের পরিকল্পনাতেই বানানো এই বাড়ি। তাঁর মৃত্যুর ছয় বছর পর এ-বাড়িতেই জন্ম সত্যজিতের। বাবা সুকুমার রায়, মা সুপ্রভা।

উপেন্দ্রকিশোরের প্রকৃত নাম কামদারঞ্জন। বাবা

কালীনাথ রায় ছিলেন ময়মনসিংহের মসুয়ার সম্ভ্রান্ত বংশীয় সুপণ্ডিত। লোকে তাঁকে মুন্সি শ্যামসুন্দর নামেই চিনত। তাঁর পাঁচ পুত্র। বড় সারদারঞ্জন, ভারতবর্ষে ক্রিকেট খেলাকে জনপ্রিয় করতে অগ্রণী ভূমিকা যাঁর। গণিতের অধ্যাপনার পাশাপাশি ক্রিকেট মাঠে প্রথম দেশীয় তারকা ছিলেন তিনিই। ছোট দুই ভাই মুক্তিদারঞ্জন এবং কুলদারঞ্জনও ক্রিকেটে পারদর্শী ছিলেন। প্রথমে ঢাকায়, পরে কলকাতায় রায় ভাইদের দাপটে ইওরোপীয় দলগুলোও তাঁদের সমীহ করে চলত। কুলদারঞ্জন ছোটদের জন্য বই লিখেছেন। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'পুরাণের গল্প', 'বত্রিশ সিংহাসন', 'বাস্কারভিল কুক্কুর', 'কোনান ডয়েলের কাহিনি'র অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আর ছোট ভাই প্রমদারঞ্জন ক্রিকেটের মাঠ ছেড়ে সার্ভে অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন উত্তর পূর্ব ভারতের দুর্গম বনে জঙ্গলে, বার্মা সীমান্তে—যার কিছু অভিজ্ঞতা লিখে রেখে গেছেন তাঁর 'বনে পাহাড়ে' বইটিতে।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি

কামদারঞ্জনের বয়স যখন পাঁচ তখন তাঁর এক কাকা, বিশিষ্ট উকিল ও জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরি তাঁকে দত্তক নেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি। কলকাতায় এসে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। বিবাহ করেন উনিশ শতকের নবজাগরণের এক পুরোধা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা বিধুমুখীকে। হিন্দু-ব্রাহ্ম বিরোধের আঁচ এই পরিবারকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি। এক সুন্দর বর্ণনা পাই উপেন্দ্রকিশোরের কন্যা পুণ্যলতা চক্রবর্তীর 'ছেলেবেলার দিনগুলি' বইতে : ''ভাইফোঁটার দিন সকালে আমরা সমস্ত ভাইবোনেরা জ্যেঠামশাইয়ের বাড়িতে জড়ো হতাম। সেদিন আর দোকানের সন্দেশ রসোগোল্লা নয়, থালাভরা কতরকম যে পিঠে-পুলি, লাড্ডু, তক্তি, ছাঁচ তার ঠিক নেই।... ঠাকুমার যেমনি উঁচু মন ছিল, তেমনি ছিল তাঁর দয়া-মায়া-বুদ্ধি-বিবেচনা...। পাড়াগাঁয়ে বিধবা মানুষদের কত কঠিন নিয়ম উপবাস ইত্যাদি করতে হয়। ঠাকুমা নিষ্ঠার সঙ্গে সে সমস্ত পালন করতেন, কিন্তু তিনি কুসংস্কারের বশ ছিলেন না। মার কাছে গল্প শুনেছি, মা যখন নতুন বউ হয়ে প্রথম দেশে গিয়েছিলেন তখন মেয়েদের জুতো পায়ে দেওয়া দূরের কথা, জামা গায়ে দেওয়াও চল ছিল না। মা একে শহরের মেয়ে তায় ব্রাহ্ম, ঠাকুমা বললেন, 'তোমার তো খালি পায়ে থাকা অভ্যেস নেই, অসুখ করবে—তুমি জুতো পায়ে দিয়ো। তাতে কোনও দোষ হবে না।' মা তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন তাঁর খালি পায়ে থাকা অভ্যাস আছে, কোনও অসুবিধা হবে না। বাবারা কায়স্থ, মা ব্রাহ্মণের মেয়ে।... গুরুজনেরা অনেকে মাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দিতেন না। বলতেন, 'তুমি ব্রাহ্মণকন্যা পায়ে হাত দিতে নেই।' ঠাকুমা হেসে বললেন, 'বামুনের বেটিই হোক আর মুসলমানের বেটিই হোক, আমার বেটার বউ যখন হয়েছে, আমি কেন পায়ের ধুলো দেব না।' ''[১]

এমনই এক উদার পারিবারিক আবহ ছিল রায় বাড়ির। ছিল দয়া, মায়া, স্নেহ আর অফুরান ভালবাসার স্রোত। গড়পার রোডে আসার আগে তাঁরা থাকতেন ২২ নং সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে,

তার আগে দীর্ঘদিন ১৩ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে লাহাদের বাড়িতে। সেখানেও ছিল এই আবহ। পাশের বাড়ির মা-মরা ছোট্ট মেয়ে সুরমাকে বাড়িতে নিয়ে এসে বড়মেয়ে সুখলতার সঙ্গে মানুষ করেছিলেন তাঁরা। সেই মেয়ের বাবা বিশিষ্ট পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বন্ধু, রামকুমার ভট্টাচার্য সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। কিন্তু মাতৃস্নেহ বা পিতৃস্নেহ কোনও কিছুরই অভাব হয়নি তার। উপেন্দ্রকিশোর আর বিধুমুখীর স্নেহচ্ছায়ায় কেটেছিল তার জীবন। বড় হতে সেই সুরমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন নিজের ছোট ভাই প্রমদারঞ্জনের। তাঁদেরই মেয়ে লীলা—যিনি পরে হয়ে উঠলেন বাংলা শিশুসাহিত্যের সেই ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরসাধিকা লীলা মজুমদার।

সুকুমার রায়

এই গড়পার রোডের বাড়ি ছেড়েই সত্যজিৎকে চলে আসতে হল বকুলবাগানে মামার বাড়িতে। ততদিনে সন্দেশ বন্ধ হয়ে গেছে। প্রেস ধুঁকছে। ঠাকুমা বিধুমুখী পৃথিবী ছেড়েছেন। মামার বাড়িতে অনেক নতুন কিছু পেলেন কিন্তু পেলেন না সেই আবহ। সে-বাড়িতে ছবি এনলার্জ করতেন তাঁর ধনদাদু কুলদারঞ্জন, তাঁর লেখা বইপত্র ডাঁই করে রাখা থাকত একপাশে। ছিলেন তাঁর কাকামণি সুবিনয় রায়, ছোটকাকা সুবিমল রায়। ছাপাখানার মধ্যিখানে ছিল এক বিরাট প্রসেস ক্যামেরা। সে-ক্যামেরা চালান তাঁদের পরিবারের নিকটজন হয়ে ওঠা রামদহিন। ছিল বিরাট এক ছাদ। আর ছিলেন এক অদৃশ্য মানুষ, তাঁর অজস্র স্মৃতি নিয়ে। তাঁর বাবা সুকুমার রায়। মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে ১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর বড় অসময়ে যিনি চলে যান পৃথিবী ছেড়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুর পর লিখেছিলেন, "আমার পরম স্নেহভাজন বন্ধু সুকুমার রায়ের রোগশয্যার পাশে এসে যখন বসেছি এই কথাই বারবার আমার মনে হয়েছে। আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি কিন্তু এই অল্পবয়স্ক যুবকটির মতো, অল্পকালের আয়ুটিকে নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অমৃতময় পুরুষকে অর্ঘ্য দান করতে প্রায় আর কাউকে দেখিনি। মৃত্যুর দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে অসীম জীবনের জয়গান তিনি গাইলেন। তাঁর রোগশয্যার পাশে বসে সেই গানের সুরটিতে আমার চিত্ত পূর্ণ হয়েছে।"[২]

লীলা মজুমদার

'আবোল তাবোলে'র আশ্চর্য জগতের নির্মাতা সুকুমার, বাংলায় 'ননসেন্স রাইম'-এর জন্মদাতা। লিখেছিলেন হযবরল-র মতো মনভোলানো বই, পাগলা দাশুর মতো কাহিনি। ছবি আঁকার বিধিবদ্ধ শিক্ষা না থাকলেও আশ্চর্য পর্যবেক্ষণদক্ষতায় তিনি গড়ে তুলেছিলেন ছবি ও ছড়ার এক অপূর্ব জগৎ। রসায়ন আর পদার্থবিজ্ঞানে ডাবল অনার্স,

মুদ্রণচর্চায় আর ফটোগ্রাফিতে অগাধ জ্ঞান, বিদেশে গিয়ে তা নিয়ে পড়াশোনা, নাটক এবং প্রবন্ধ রচনায় অতুলনীয় প্রতিভা, কিন্তু সেই সুকুমার রায়কে ঘিরে ছোট্ট সত্যজিতের মনে ঝাপসা একটামাত্র টুকরো স্মৃতি। স্বাস্থ্য উদ্ধারে তিনি তখন সোদপুরে, গঙ্গার উপর উঠোনওলা এক বাড়িতে। ছবি আঁকছেন জানালার ধারে বসে, এমন সময় হঠাৎ বললেন, ‘‘জাহাজ যাচ্ছে।’’ অমনি তাঁর দুবছরের ছেলে দৌড়ে বেরিয়ে এসে দেখল ভোঁ বাজিয়ে একটি স্টিমার চলে গেল। বাবাকে কাছে পাওয়া আর তার হল না। সেই স্টিমারের মতো তার বাবাও চলে গেলেন একদিন তাকে ছেড়ে, না ফেরার পথে।

অন্য পথের সন্ধানে

পথ তো খোলা ছিল। যে-কোনও ধরাবাঁধা পথেই হেঁটে যেতে পারতেন সত্যজিৎ। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে ১৯৩৬ সালে পনেরো বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করার পর তিনি ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। বাবার বন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ইচ্ছেতে একরকম জোর করেই শেষ বছরে ইকনমিক্স পড়তে হল তাঁকে, যাতে গ্র্যাজুয়েশন শেষ হলেই স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে একটি চাকরি জুটে যায়। কিন্তু আঠারো বছরের ছেলেকে মা কিছুতেই চাকরির জগতে ঢুকতে দিতে চান না, ছেলেও চায় কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হতে। মা চাইলেন ওসব পরে হবে, আগে ছেলে শান্তিনিকেতনে যাক। সেখানে ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হোক। কিন্তু ছেলের তেমন ইচ্ছে নেই। প্রবাসী পত্রিকায় ওরিয়েন্টাল আর্টের যে-নমুনা তিনি দেখেছিলেন তা তাঁর মনে শান্তিনিকেতনের শিল্পশিক্ষা নিয়ে একটু অন্যরকম ধারণার জন্ম দিয়েছিল। মা তাঁকে সোজাসুজি নিয়ে গেলেন নন্দলাল বসুর কাছে। বলেও ফেললেন সেকথা। শুনে হাসলেন নন্দলাল। তারপর শুরু হল তাঁর আঁকা শেখা—বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, নন্দলাল বসুর কাছে। ১৯৪০ থেকে ১৯৪২—মোট আড়াই বছর সত্যজিৎ শান্তিনিকেতনে ছিলেন। পরবর্তী কালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, ‘‘মায়ের একটা অনেক-দিনের শখ ছিল যে আমি শান্তিনিকেতনে যাই, রবীন্দ্রনাথ তখনও বেঁচে—তাঁর সান্নিধ্যে কিছুটা কাল কাটিয়ে আসি। কলাভবনে নন্দলাল-বাবুর কাছে আঁকাটা শিখে আসি। আমি নিজে চিত্রশিল্পী হওয়ার কথা কোনওদিনই ভাবিনি। আমি ছবি আঁকা শিখতে গিয়েছিলুম, বিশেষ করে আর্ট হিস্ট্রি সম্পর্কে, আমাদের শিল্পের পশ্চাৎপটটা কী, সেই জ্ঞান সংগ্রহের একটা ইচ্ছে আমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যায়। আমাদের ট্র্যাডিশনটা কী? ফাইন আর্টস শেখার ইচ্ছে আমার ছিল না। আর্টের লাইনে যেতে গেলে আমি কমার্শিয়াল আর্টকেই বেছে নিতাম; কিন্তু আমি জানতাম আমাদের আর্টের ট্র্যাডিশনটা জানা থাকলে আমার সুবিধে হবে।’’[৩]

নন্দলাল বসু

শান্তিনিকেতনেই আদ্যন্ত নাগরিক সত্যজিৎ চিনতে শিখলেন গ্রামবাংলাকে। বাংলার প্রকৃতি রংরূপ নতুন করে তাঁর চোখে ধরা দিল। সেখানকার মানুষ, তাদের সুখ-দুঃখময় জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ

অভিজ্ঞতা লাভ করলেন তিনি। নন্দলাল বসু ছবিকে রেখাতে আটকে না রেখে ছবির ভাব আর অন্তর্নিহিত ছন্দকে অনুভব করতে শেখালেন। বিনোদবিহারী ছবি আঁকার পাশাপাশি তাঁর অসামান্য ক্যালিগ্র্যাফির শিক্ষায় দীক্ষিত করলেন তাঁকে। কিন্তু পাঠ অসমাপ্ত রেখেই সত্যজিৎ কলকাতায় ফিরে এলেন আড়াই বছর পর। ততদিনে ফাইন আর্টসের শিক্ষা তাঁর হয়ে গেছে, তিনি শিল্পশিক্ষক হতে চাননি। কমার্শিয়াল আর্টের দিকেই তাঁর ঝোঁক আর তার চর্চা তো শান্তিনিকেতনে হয় না। কাজেই নন্দলাল বসু অনুমতি দিলেন ছাত্রকে শান্তিনিকেতন ছাড়ার। কলকাতায় এসে কিছুদিনের মধ্যেই যোগ দিলেন ডি জে কিমারের এজেন্সিতে জুনিয়র আর্টিস্ট পদে। সেটা এপ্রিল ১৯৪৩। শুরু হল তাঁর জীবনের এক নতুন অধ্যায়।

ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকার প্রতি সহজাত ঝোঁক ছিল সত্যজিতের। সন্দেশের অন্যতম সম্পাদিকা নলিনী দাশ ছিলেন তাঁর প্রিয় নিনিদিদি, মেজপিসি পুণ্যলতা চক্রবর্তীর মেয়ে। তিনি স্মৃতিচারণে লিখেছেন, ‘‘ছোটবেলা থেকেই মানিক চমৎকার ছবি আঁকত। বছর দশেক বয়সে রাজা রামমোহন রায়ের একটা আশ্চর্য সুন্দর পেনসিল স্কেচ করেছিল।’’[৪] ছবি আঁকতে আঁকতেই নিজের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন সত্যজিৎ। কিমারের অফিসে সান্নিধ্য পেলেন আর্ট ডিরেক্টর অন্নদা মুন্সি এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার দিলীপকুমার গুপ্তের। অন্নদা মুন্সির অভিভাবকত্বে নিজেকে সঁপে দিলেন সত্যজিৎ, নিলেন বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকার শিক্ষা। কীভাবে লে আউট করতে হয়, লোগো বানাতে হয়, আকর্ষণীয় ক্যাপশনে ছবি সাজালে তা জনমনে প্রভাব ফেলে—সেসব শিখলেন। কিন্তু প্রকৃত মণি-কাঞ্চন যোগ ঘটেছিল তাঁর সঙ্গে ডিকে-র। দিলীপকুমার গুপ্তকে সকলে ওই নামেই ডাকতেন। বিজ্ঞাপনের এজেন্সিতে চাকরি করলেও ডিকে-র আসল উৎসাহ ছিল গ্রন্থনির্মাণে। কিমারের কলকাতা অফিসের দায়িত্ব সামলে তাই এক নতুন প্রকাশনা সংস্থা খুললেন তিনি : ‘সিগনেট প্রেস।’ সত্যজিৎ লিখেছেন, ‘‘I was roped into design book jackets, while DK himself looked after the production. The first set of Bengali books that Signet brought out created a sensation in the publishing world. My own contribution was not insignificant as I used, for the first time in books, traditional Bengali motifs on the jackets, sometimes with an illustration brush or pen.’’[৫]

বাংলার সেই ঐতিহ্য, শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন যার শিকড় চিনেছিলেন সত্যজিৎ, সিগনেট প্রেসের প্রচ্ছদ জুড়ে তার শিল্পসম্মত প্রয়োগ ঘটালেন তিনি। একের পর এক কবিতার বই-ই শুধু নয়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ’ গ্রন্থে নামাবলির ডিজাইন হইচই ফেলে দিল প্রকাশনা জগতে। এই সিগনেট প্রেসের ছবি আঁকার সূত্রেই অন্য এক পথের কাহিনির সঙ্গে পরিচয় হল তাঁর। সে-পথ অপুর জীবনপথ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালি’ পড়তে বসলেন তিনি। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে স্বল্পপরিচিত সত্যজিতের মনে তা জাগিয়ে তুলল বিস্ময় আর শ্রদ্ধা। তাঁর মনে হল, ‘‘It was plainly a masterpiece and a sort of encyclopaedia of life in rural Bengal.’’[৬] উপন্যাসের কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ, দৃশ্য, প্রকৃতিবর্ণনার জীবন্ত উপস্থাপন, প্রতিদিনের চেনা জীবনের টুকরো টুকরো ছবি, অস্তিত্বের সংকট, যাপনের মধ্যে নিহিত দুঃসহ লড়াই, মানবিকতা, কাব্যময় উপস্থাপন—সবকিছুই সত্যজিতের অনুভবের সঙ্গে মিশে গেল। ‘পথের পাঁচালি’-র

কিশোরপাঠ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'আম আটির ভেঁপু'র ছবি আঁকতে আঁকতে সত্যজিতের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল চরিত্র আর ঘটনাগুলি। একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে ডিকে তাঁকে বললেন, ''পথের পাঁচালি-র এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণে দারুণ একটা সিনেমার সম্ভাবনা আছে।'' কথাটা যে সত্যজিতেরও মনে আসেনি তা নয়। ছবি আঁকার পাশাপাশি তাই চলতে থাকল অন্য এক পরিকল্পনার নকশা। সেটা ১৯৪৪। এর ছ-বছর পর কলম্বো থেকে জাহাজ ছাড়ল। সস্ত্রীক সত্যজিৎ প্রথমবার পাড়ি জমালেন লন্ডনের উদ্দেশে। ষোলো দিনের যাত্রাপথে সঙ্গী হল 'পথের পাঁচালি'। নোটবুকের পাতায় গড়ে উঠতে লাগল এক-একটা দৃশ্যের পরিকল্পনা। বিলম্বিত যাত্রাপথের একঘেয়েমি এক মুহূর্তের জন্য অবসাদ জাগাল না তাঁর মনে। অপু আর দুর্গাকে নিয়ে হরিহর আর সর্বজয়ার দারিদ্র্য, সংগ্রাম ঘিরে রইল তাঁকে। জলপথে যেতে যেতে অন্য এক পথের ছবি আঁকা চলল, যে-পথ তাঁকে একদিন নিয়ে যাবে বাংলা থেকে ভারত ছুঁয়ে পৃথিবীর পথে।

নতুন পথের খোঁজে

আলো আর অন্ধকার, ছবি তোলা আর ছবি দেখা নিয়ে ছোট্ট সত্যজিতের একটা নিজস্ব জগৎ ছিল। গড়পারে থাকতে তিনি ধনদাদু কুলদারঞ্জনের কার্যকলাপ দেখতেন—ছোট ছবিকে কী কৌশলে বড় করা যায়। নিজের আঁকা ছবি নিয়ে হাজির হতেন 'সন্দেশে'র দপ্তরে, ছবি ছাপানোর দাবি নিয়ে। ঘরের লোক হয়ে যাওয়া রামদহিন তাঁর খোকাবাবুকে কোলে তুলে নিয়ে ক্যামেরার নিচের দিকে মুখ করা লেন্সের তলায় সেই হিজিবিজি ছবি বিছিয়ে রেখে ঘষা কাচে তার উলটো ছায়া দেখিয়ে দিতেন। বকুলবাগানে মামার বাড়িতে দিনের বেলা চারদিক বন্ধ করা শোয়ার ঘরের খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আসা আলো যখন ঘরের উলটোদিকের দেওয়ালে রাস্তার চলমান দৃশ্যের ছায়া ফুটিয়ে তুলত তখন তার দিকে অসীম আগ্রহে তাকিয়ে থাকতেন সত্যজিৎ। আর ছিল স্টিরিওস্কোপ যন্ত্র। স্থির দৃশ্যকে দৃষ্টিবিভ্রমে সচল মনে হত তাতে। আরও আনন্দের ছিল ম্যাজিক ল্যানটার্ন। বাক্সের ভেতর জ্বলন্ত কেরোসিনের বাতি, তার আলো হাতল দিয়ে ঘোরানো ফিল্মের ওপর পড়লে সিনেমার মতো চলন্ত ছবি ফুটে ওঠে চোখের সামনে। সেই ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফিল্মের প্রতি একটা আকর্ষণ গড়ে উঠল সত্যজিতের মনে। সে-আকর্ষণ বাড়তে থাকল মামাদের সঙ্গে সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখতে দেখতে। বেন হুর, কাউন্ট অফ মন্টে ক্রিস্টো, থিফ অফ বাগদাদ, আঙ্কল টম্‌স কেবিন—নির্বাক যুগের এইসব ছবি শিশু সত্যজিতের মনে যে-আগ্রহের সঞ্চার করল তা আরও বিবর্তিত ও বিকশিত হল যৌবনে—প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় এবং পরে শান্তিনিকেতনে। পরে তিনি বলেছেন, ''স্কুলে থাকতে থাকতেই সিনেমা দেখার প্রচণ্ড একটা নেশা আমাকে পেয়ে বসেছিল। কলেজেও সেটা ছিল। সত্যি কথা বলতে কী, ডি জে কিমারে যখন আমি যোগ দিই, তার প্রথম দিকেও ওই নেশা আমার প্রবল।''[৭]

শান্তিনিকেতনের দিনগুলিতে সিনেমার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কমে এসেছিল। তবু শুধু ভাল সিনেমা দেখার নেশায় তিনি ছুটে আসতেন কলকাতায়, প্রতি বুধবার ছুটিতে। স্কুলে পড়ার সময়েই হলিউডের হালচাল নিয়ে কৌতূহল জেগেছিল তাঁর মনে কিন্তু তা নিতান্তই শিশুসুলভ। পুদোভকিনের 'ফিল্ম টেকনিক অ্যান্ড মেকিং' এবং লুই জেকবের 'রাইজ অফ অ্যামেরিকান ফিল্ম' বই দুটি পড়ার পর থেকেই তাঁর চিন্তাজগতে আলোড়ন শুরু হল। চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পরিচালনার বিভিন্ন দিক নিয়ে ভাবনার একটা নতুন আকাশ খুঁজে পেলেন তিনি। সিনেমা দেখতে দেখতে শুধুমাত্র অভিনয় নিয়ে নয়, তিনি মনোযোগী হলেন দৃশ্য এবং শব্দপ্রয়োগের অভিনব কৌশল নিয়ে। ক্যামেরা কোথায় বসানো হচ্ছে, ছবির দৃশ্য কখন বদলে যাচ্ছে, সিনেমায় কাহিনি কীভাবে বলা হচ্ছে, একজন পরিচালকের সঙ্গে অন্য একজনের প্রয়োগগত ও ভাবনাগত পার্থক্য কোথায়, একজন বড় পরিচালক কীভাবে নিজের আলাদা চিত্রভাষা নির্মাণ করছেন—এই সবকিছুই তাঁকে আকর্ষণ করল। শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারে পেয়ে গেলেন পল রোথার 'দি ফিল্ম টিল নাও' আর রেমন্ড স্পটিশউডের 'গ্রামার অফ দি ফিল্ম' বই দুটি। পড়ে তাঁর মনে হল, বাংলায় চলচ্চিত্র নিয়ে যে-ভাবনা গড়ে উঠেছে দর্শকের মনে, তাকে আমূল বদলে দিতে হবে। নিজে সিনেমা নির্মাণ করবেন বা পরিচালক হবেন, সেই স্বপ্ন দেখা তখনও সেভাবে শুরু হয়নি কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্রের দীনতা তাঁকে আঘাত করল। উন্নত, শিল্পবোধসম্মত সিনেমা-সংস্কৃতি গড়ে তোলার তাগিদ অনুভব করলেন।

কিন্তু বাড়ির লোকজনের প্রবল আপত্তি। সিনেমার জগতে কোনও নিশ্চয়তা নেই, উপার্জন অনিয়মিত এবং আর্থিক নিরাপত্তার অভাব। তাই স্থায়ী চাকরি খুঁজে তাতে উন্নতি করে প্রতিষ্ঠা লাভ করুন সত্যজিৎ—সেটাই সকলের চাওয়া। ডি জে কিমারে চাকরি পেয়ে সেই পথেই হাঁটছিলেন তিনি কিন্তু 'পথের পাঁচালি' পড়বার পর থেকেই সেই ধরাবাঁধা চাকরির পথ একটু যেন ফিকে হতে আরম্ভ করল। অন্য এক পথের ডাক শুনতে পেলেন সত্যজিৎ। সে-পথ চলচ্চিত্র নির্মাণের পথ। বাংলা ছবিকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার পথ।

এই পর্বে শুধু চলচ্চিত্র নয়, আর একটি বিষয় নিয়েও তাঁর আগ্রহ গড়ে উঠেছিল—তা হল পাশ্চাত্য সংগীত। উপেন্দ্রকিশোর ভাল বেহালা বাজাতেন। মামার বাড়িতে সবাই ভাল গান গাইতে পারতেন, পরিবেশটাই ছিল গানের। মা-ও ভাল গান গাইতেন। মাসি কনক দাস ছিলেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী। গান না গাইলেও সত্যজিতের সুরজ্ঞান ছিল গভীর, আর এই বিষয়ে তাঁর মনে প্রাথমিক ধারণা গড়ে দিয়েছিলেন তাঁর মা সুপ্রভা। ছোটবেলায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ছোট ভাই তাঁর প্রিয় বুলাকাকা প্রফুল্লচন্দ্র, সত্যজিৎকে দিয়েছিলেন একটা কিডিফোন আর কিছু রেকর্ড। আর একটু বড় হয়ে তাঁর কাছ থেকেই উপহার পেলেন গ্রামাফোন আর একটি রেকর্ড—বেঠোফেনের ভায়োলিন কনচেরটোর শেষ মুভমেন্ট। গান নিয়ে তাঁর ভালবাসা স্কুলজীবন থেকেই, হাতখরচ আর টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে পাশ্চাত্য সংগীতের রেকর্ড কিনে আনতেন। শান্তিনিকেতনে গিয়ে পেলেন ইংরেজির অধ্যাপক অ্যালেক্স অ্যারনসনকে। জার্মান ইহুদি এই অধ্যাপকের কাছে ধ্রুপদি পাশ্চাত্য সংগীতের সংগ্রহ ছিল। বিকেল হলেই সত্যজিৎ চলে যেতেন তাঁর কুটিরে, মেতে উঠতেন সংগীতের সুরে। কলকাতায় চাকরিজীবনে প্রবেশ করে আরও একজনের বাড়িতে পাশ্চাত্য ধ্রুপদি সংগীতের লোভে প্রায়শই ছুটে যেতেন তিনি, তাঁর নাম নীরদ সি চৌধুরি। সত্যজিতের জন্য তাঁর দরজা খোলাই থাকত।

এছাড়া ছিলেন বন্ধু নর্ম্যান ক্লেয়ার, তখন রয়্যাল এয়ারফোর্সের গোয়েন্দা বিভাগের কর্মী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শুনে আর দাবা খেলে কাটাতেন দুজনে।

ডি জে কিমারে সত্যজিৎ চাকরি করছেন, চলছে ছবি আঁকা, গান শোনা, সিনেমা নিয়ে চিন্তাচর্চা। আমেরিকান তথ্যকেন্দ্রে থিয়েটার আর্টসের নতুন সংখ্যা পড়বার জন্য ছুটে যাচ্ছেন, সমমনস্ক বন্ধুদের সঙ্গে মিলে খুলে ফেলছেন ক্যালকাটা ফিল্ম ক্লাব—যা পরবর্তী কালে নাম বদলে হল কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি। পরিচয় হল এক কাশ্মীরি যুবকের সঙ্গে—বংশী চন্দ্রগুপ্ত। এলেন চিদানন্দ দাশগুপ্ত, পরবর্তী কালে যাঁর কন্যা অপর্ণার ফিল্মে অভিষেক ঘটবে সত্যজিতেরই পরিচালনায় 'সমাপ্তি'র মৃন্ময়ীর ভূমিকায়। এলেন হরিসাধন দাশগুপ্ত, অসিত সেন। সকলে মিলে হরিসাধন দাশগুপ্তের পরিচালনায় একটি বিজ্ঞাপনের ছবিও বানালেন আট মিনিটের, নাম 'আ পারফেক্ট ডে', চিত্রনাট্য লিখলেন সত্যজিৎ। এইসময়েই সমকালীন ভারতীয় চলচ্চিত্রের সমস্যা নিয়ে লিখলেন একটি অসামান্য নিবন্ধ : 'হোয়াট ইজ রং উইথ ইন্ডিয়ান ফিল্মস।' সিনেমা নিয়ে তাঁর প্রথম চিন্তার প্রকাশ ঘটল ১৯৪৮ সালে স্টেটসম্যানের পাতায় : "What the Indian Cinema needs today is not more gloss, but more imagination, more integrity, and more intelligent appreciation of the limitations of the medium."[৮]

নতুন এক পথের সন্ধান করছেন তখন একদল যুবক। সিনেমার নতুন আঙ্গিক নির্মাণের জন্য তাঁরা যখন চিন্তা করছেন, ঠিক তখন 'দি রিভার' ছবির শুটিং করতে কলকাতায় এলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা জঁ ক্লদ রেনোয়া। ১৯৪৯ সালের এক সকালে সত্যজিৎ স্টেটসম্যান খুলে দেখলেন একটি দুলাইনের বিজ্ঞাপন : গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে ইংরেজি বলতে পারা ভারতীয় অভিনেতাদের ইন্টারভিউ নিতে চাইছেন তিনি, তাঁর একটি ইংরেজি ছবির জন্য, যা ভারতে শুটিং করা হবে। এ প্রায় স্বপ্নের মতো। রেনোয়ার ছবির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল অনেক আগেই, কিন্তু ব্যক্তি রেনোয়ার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটল প্রথম। স্টুডিওর সেটিং-এর বাইরে খোলা আকাশের নিচে কীভাবে শুটিং করতে হয়, রেনোয়ার সাহচর্যে সেই শিক্ষা অর্জন করলেন তিনি। যা তাঁকে সবথেকে বেশি অবাক করল তা হল সাধারণ মানুষ, প্রকৃতির দৃশ্যপট, কুঁড়েঘর, বাড়ি, দালান, পুকুরপাড়ের কচুরিপানা, কলাগাছের ঝোপ—সবকিছুকেই এক নতুন আঙ্গিকে দেখা এবং দেখানোর চেষ্টা। এক চিত্রকরের মুগ্ধ দৃষ্টিতে রেনোয়া প্রকৃতিকে দেখলেন এবং দেখালেন। চোখের সামনে একটা একটা করে জানালা দরজা খুলে গেল সত্যজিতের। তিনি পরে বলেছেন, "রেনোয়াই যে আমার মনের মধ্যে চলচ্চিত্র নির্মাণের চিন্তাভাবনার বীজ পুঁতে দিয়ে গিয়েছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি কি সত্যি পরিচালক হতে চাই? আমি বলেছিলাম হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কোনও বিষয় ভেবেছ? আমি তাঁকে পথের

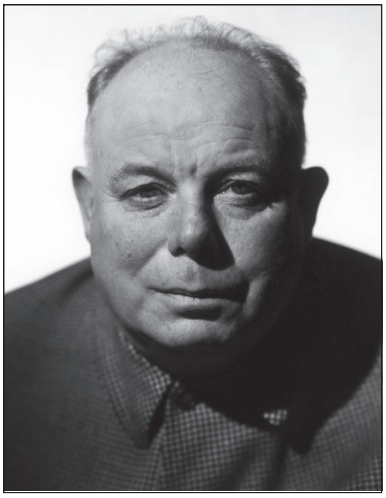
জঁ ক্লদ রেনোয়া

পাঁচালির রূপরেখাটুকু শোনালাম। যে কাহিনি নিয়ে ছবি করবার স্বপ্ন আমার মনে সেই সময় চেপে বসেছে।... তিনি আমাকে উৎসাহিত করলেন।"[৯] দীর্ঘ ছ-বছর ধরে 'পথের পাঁচালি'কে ঘিরে তাঁর ভাবনা ধীরে ধীরে গভীরতা পেল। আরও একটু সাহস আর আত্মবিশ্বাসে ভর করে প্রথম বিদেশযাত্রার অবসরে সমুদ্রের বুকে মেতে উঠলেন 'পথের পাঁচালি'র চিত্রনাট্য নিয়ে। এ কোনও প্রথাগত চিত্রনাট্য নয়। একটার পর একটা দৃশ্য পরিকল্পনার ছবি। নতুন সে এক পথের ছবি, নতুন এক পথের কাহিনি। তবু কিছু পথ হাঁটা বাকি ছিল। লন্ডনে গিয়ে ইওরোপ-আমেরিকার সেরা পরিচালকদের ছবি দেখে ইচ্ছেটা জোরদার হল মনে। ফিরে এসে ফিল্ম সোসাইটির প্রথম ফেস্টিভ্যালের পর, মনে কোনও সংশয় রইল না যে চলচ্চিত্র পরিচালনার পথই তাঁর পথ। আর এই 'পথের পাঁচালি' দিয়েই হবে সেই পথ হাঁটার শুরু।

পথ নির্মাণের পাঁচালি

"ছবির পর্দায় এরকম দেখেছিস কখনও? এরকম মরা ব্যাঙ, জলের ওপর পোকা মাকড়ের খেলা, গ্রামের শুঁড়িপথ, কাশবন, অনেক দূরে হারিয়ে যাওয়া রেলের লাইন—সবকিছু যেন জীবন্ত। তার চেয়েও জীবন্ত এই ছবির মানুষগুলো। এতকাল তো সিনেমার পর্দায় সাজা মানুষ দেখে এসেছি। নিজেও যা করেছি সব সাজা মানুষ। এই পথের পাঁচালি ছবিটা দেখিয়ে দিল আমরা কতটা ব্যাকডেটেড।"[১০] ১৯৫৫ সালের ২৬ আগস্ট মুক্তি পায় 'পথের পাঁচালি'। সেই ছবি দেখে এক বিশিষ্ট সাংবাদিককে এই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্য। তিনি তখন হাজারি ঠাকুরের ভূমিকায় মঞ্চ মাতাচ্ছেন। বিভূতিভূষণের আর এক অসামান্য সৃষ্টি 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' তখন নাটকের মঞ্চেও আশ্চর্য সফল তাঁর অভিনয়প্রতিভার গুণে। বিশিষ্ট পরিচালক দেবকীকুমার বসুও মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করলেন এ-ছবির। সত্যজিৎ রায়কে বললেন 'বাংলা ছবির পথপ্রদর্শক'। আর এক বিশিষ্ট সাংবাদিক লিখলেন, "চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রের সঙ্গে আগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। আলোক-চিত্রশিল্পী সুব্রত মিত্র 'দি রিভার' ছবিখানিতে একজন সহযোগীর কাজ করেছেন; আর শিল্পনির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্তেরও চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংস্রব বেশি নয়। এই তিনজন আর তার সঙ্গে অন্য দেশ হতে বাতিল হয়ে যায় এমনই সরঞ্জাম তাও নেহাৎই অপ্রচুর, কিন্তু তাই নিয়েই এঁরা ঐন্দ্রজালিকের মতো যা সৃষ্টি করেছেন তা পৃথিবীর সেরা সব সরঞ্জাম নিয়েও হয় না। দিনের পর দিন মাসের পর মাস, শিল্প ও নাট্যসঙ্গত ভালটুকু ভেবে ভেবে, খুঁজে খুঁজে ছন্দোবদ্ধ দৃশ্যে গেঁথে গেঁথে ক্যামেরায় তোলার যে আদর্শ ধৈর্য, অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতার কাহিনি ছবিখানি নির্মাণের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, সেইটেই একটা ইতিহাস।"[১১]

সত্যিই সে এক ধৈর্য আর কষ্টসহিষ্ণুতার ইতিহাস। সে-ইতিহাসে আছে তীব্র অর্থাভাব, অনেক বাধাবিপত্তি আর এসবের মধ্যে দাঁড়ানো এক দীর্ঘদেহী পুরুষের জেদ। তিনি সত্যজিৎ রায়। পথের পাঁচালির মতো ব্যতিক্রমী ভাবনাকে চলচ্চিত্রায়িত করতে গিয়ে যাঁকে প্রতি পদক্ষেপে বাধার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তিনি ছবি করছেন জানতে পেরে পথের পাঁচালির চলচ্চিত্র স্বত্ব কিনে নেওয়ার চেষ্টা শুরু করেছিলেন কল্পনা মুভিস, যাঁদের কাছে সত্যজিৎ নিজেই গিয়েছিলেন 'পথের পাঁচালি'র প্রযোজনার প্রস্তাব নিয়ে। তাঁরা চাইলেন দেবকীকুমার বসুকে দিয়ে পথের পাঁচালি বানাবেন। এলেন বিশিষ্ট পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে। বিশিষ্ট লেখিকা বিভূতিভূষণের পরিবারের পরিচিতা

বাণী রায় চাইলেন স্বত্ব কিনতে। তাঁর একান্ত ইচ্ছে তাঁর ভাই নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে পরিচালনা করবেন এই ছবি। দশ হাজার টাকা দিতেও রাজি তিনি। ফিরিয়ে দিলেন বিভূতিভূষণের স্ত্রী রমা দেবী। সত্যজিৎ রায়কে তিনি যে আগেই কথা দিয়েছেন! এ নিয়ে ভাই চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়কে তিনি বলেছিলেন, ''আমি সত্যজিৎবাবুকে যে কথা দিয়েছি, টাকার লোভে তার ব্যতিক্রম করতে পারব না। তাছাড়া সত্যজিৎবাবুও আমার বাবলুর মতো শৈশবে পিতৃহীন। মায়ের একমাত্র সন্তান। বাবলুকে মানুষ করতে করতে বুঝতে পারছি কত কষ্ট করে সত্যজিৎবাবুকে তাঁর মা মানুষ করেছেন। আমারই মতো বয়সে অথবা আমার থেকে আরও অনেক অল্প বয়সে সত্যজিৎবাবুকে নিয়ে তাঁর মা বিধবা হয়েছিলেন। তোর মেজদা (বিভূতিভূষণ) ছিলেন জাতশিল্পী। তাঁর রচনাও গতানুগতিক নয়। আমার মনে হয় না যাঁরা গতানুগতিক পথের পথিক, তাঁরা পথের পাঁচালির ঠিক ঠিক রূপ দিতে পারবেন।''[১২]

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

উপেন্দ্রকিশোরের নাতি, সুকুমার রায়ের ছেলে সত্যজিতের প্রতি এই স্নেহ-মমতার কারণেই আরও প্রায় দশটি প্রস্তাব এবং বড় অঙ্কের আর্থিক প্রলোভন এড়িয়ে পথের পাঁচালির চিত্রস্বত্ব আগলে রেখেছিলেন রমা দেবী—সত্যজিৎ রায়ের জন্য।

কিন্তু তাঁর মতো মাতৃহৃদয় নিয়ে তো সবাই বসেছিলেন না। আর ডিকে-র মতো নিরন্তর উৎসাহ আর সাহস জোগানোর লোকই বা কোথায়? তাই অবিশ্রান্ত বাধা আসতে লাগল। নিউ থিয়েটার্সের বি এন সরকার, কল্পনা মুভিস—কেউ রাজি হলেন না প্রযোজনা করতে। বন্ধু আশিস বর্মন আলাপ করিয়ে দিলেন উদ্দীপনাময় অনিল চৌধুরির সঙ্গে। তিনি এক প্রডিউসারের সন্ধান দিলেন, কিন্তু তিনি বললেন যদি তাঁর আগামী ছবি সাফল্য পায় তাহলেই তিনি পথের পাঁচালি প্রযোজনায় রাজি। এসব অনিশ্চয়তার মধ্যেই চলতে লাগল অভিনেতা নির্বাচন। বন্ধুর স্ত্রী করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনে মনে সত্যজিৎ ভেবে রেখেছিলেন সর্বজয়া চরিত্রের জন্য। যদিও গ্রাম্য দরিদ্র পরিবারের বধূ হিসেবে ঠিক মানায় না এতটা মার্জিত, সম্ভ্রান্ত, রুচিশীলা কাউকে। কিন্তু ক্যামেরায় তাঁকে দেখলে অবিশ্বাসের কারণ থাকে না কোনও। রুমকি বন্দ্যোপাধ্যায় ছোট দুর্গার চরিত্রে মানিয়ে যাবে ভাবা হল। হরিহরের চরিত্রে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচন নিয়েও কোনও সন্দেহ নেই কারও মনে। বেলতলা গার্লস স্কুলে হাজির হয়ে আশিস বর্মন খুঁজে আনলেন 'দুর্গা' উমা দাশগুপ্তকে—মোহনবাগানের বিশিষ্ট ফুটবলার, গোষ্ঠ পালের সমসাময়িক পল্টু দাশগুপ্তের কন্যা। পল্টুবাবু চাননি মেয়ে সিনেমায় অভিনয় করুক কিন্তু নাছোড়বান্দা সত্যজিৎ। শেষ পর্যন্ত মত দিলেন তিনি। অপুর খোঁজেও স্কুলে স্কুলে ঘোরা হল, বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। শেষ পর্যন্ত সত্যজিতের স্ত্রী বিজয়া পাশের বাড়িতে একটি ছেলেকে খেলতে দেখে ডেকে পাঠালেন। একেবারে অবিকল অপু। মায়াঘেরা চঞ্চল দুটো চোখ, রোগা চেহারা, সহজ সরল দৃষ্টি। মুশকিল হল বিধবা পিসি ইন্দির ঠাকরুণকে নিয়ে। তাঁর চরিত্র করবার মতো বৃদ্ধা, শীর্ণদেহী কারও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। রেবা দেবী বললেন, বিশিষ্ট মঞ্চ

অভিনেত্রী নিভাননী দেবীর বাড়িতে থাকেন চুনিবালা দেবী। একসময় মঞ্চে অভিনয় করতেন। নিভাননী তাঁকে 'মা' বলে ডাকেন। তাঁকে একবার দেখে আসা যায়। চুনিবালাকে একবার দেখেই সত্যজিৎ বুঝলেন, ইনিই সেই মানুষ যাঁকে ওই চরিত্রের জন্য নির্বাচনে কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না। অটুট স্মৃতি, শুকনো চামড়া, ছোট করে ছাঁটা চুল নিয়ে বুকে একরাশ আক্ষেপ জড়িয়ে, শেষ জীবনীশক্তিটুকু যেন তিনি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এই চরিত্রের জন্যই। কেউ ছিল না তাঁর। বয়স হতেই মঞ্চ থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল চুনিবালা দেবীকে। নিভাননী দেবীকে মেয়ের মতো স্নেহ করতেন বলে আশ্রয় দিয়েছিলেন তিনি। নিভাননী দৈনিক দশ টাকা পারিশ্রমিক চেয়েছিলেন তাঁর এই মায়ের জন্য। অনিল চৌধুরি কুড়ি টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলেন।

কিন্তু অন্য যাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁরা পিছিয়ে এলেন। ছবি নির্মাণের জন্য প্রথমে তাঁরা সত্তর হাজার টাকা বাজেট রেখেছিলেন, তারপর খরচ কমিয়ে চল্লিশ হাজার বললেন। তবুও কোনও প্রডিউসার ঝুঁকি নিতে রাজি নন। নায়ক-নায়িকা নেই, গান নেই, রোমান্স নেই—এই সিনেমা লোকে দেখবে কেন? শুধুশুধু টাকা অপচয় করতে রাজি হলেন না কেউ। বোড়ালে মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায় পরিত্যক্ত বাড়িটা নেওয়া হয়েছিল অনেক কষ্টে। বংশী চন্দ্রগুপ্ত এবং অনিল চৌধুরি বাড়িটিকে শুটিংয়ের উপযোগী করে গড়ে তুলতে রোজ বোড়াল ছুটে যেতেন। লোক লাগিয়ে মনের মতো করে বানাতে লাগলেন সব। অথচ সবাই পিছিয়ে যাচ্ছেন। নতুন এক প্রযোজক পাওয়া গেল, রানা দত্ত। তিনি চল্লিশ হাজার টাকা দিতে রাজি হলেন। প্রাথমিকভাবে তাঁর টাকাতেই প্রবল উদ্যমে এগোতে লাগল কাজ। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার তা বন্ধ হয়ে গেল। রানা দত্তের একটি ছবি বক্স অফিসে ব্যর্থ হতেই হাত গুটিয়ে নিলেন তিনি। ভয়ংকর বিপদে পড়লেন সবাই। আস্তে আস্তে টাকা জোগাড়ের সব পথ বন্ধ হয়ে এল। মাঝপথেই বন্ধ করে দিতে হল শুটিং। ১৯৫৩ সালের শুরু থেকে যে-উৎসাহ উদ্দীপনায় একঝাঁক যুবক একরাশ স্বপ্ন নিয়ে পথে নেমেছিলেন—সব থেমে গেল বছরের মাঝামাঝি। এতদিন অনিল চৌধুরি মাঝরাতে ট্রামরাস্তায় বচ্চন সিংয়ের ট্যাক্সি নিয়ে শুয়ে থাকতেন—কখন ভোরের ফার্স্ট ট্রাম আসবে, বিরক্ত হয়ে ঘণ্টা বাজাবে আর তাঁর ঘুম যাবে ভেঙে। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে—আগে উত্তর কলকাতা থেকে চুনিবালা দেবীকে তুলে, যেতে হবে ভবানীপুরে রূপচাঁদ মুখার্জি লেনে উমা দাশগুপ্তকে তুলতে, তারপর ছুটতে হবে বোড়ালে। সেখানে পুরো ইউনিট রেডি হয়ে আছে—আটটা বাজলে আলো একটু স্পষ্ট হলেই শুরু হয়ে যাবে শুটিং। সেই কর্মচঞ্চল অনিল চৌধুরিও হতাশ হয়ে পড়লেন, বন্ধ করে দিলেন আসা। ওদিকে তখন তিনভাগের মাত্র একভাগ শুটিং শেষ হয়েছে।

এর প্রায় আট মাস পর একদিন সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে এলেন অনিল—মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে যাওয়ার প্রস্তাব নিয়ে। মহাকরণের এক পরিচিত ক্লার্ক তাঁকে বলেছেন বিধানচন্দ্র ব্রাহ্ম, তাঁর মনে যদি আর এক ব্রাহ্মসমাজের মানুষের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে তোলা যায় তাহলে কাজ হতে পারে। আলোচনা শুনে মাথা নাড়লেন সত্যজিতের মা সুপ্রভা দেবী। না, এইভাবে হবে না। ''ড. রায়কে রাজি করানোর একটা উপায় আমি জানি"—বলে হাসলেন তিনি। তিনি জানতেন বিধানচন্দ্র তাঁর বন্ধু বেলা সেনদের বাড়িতে প্রায়ই আসেন। শেষ পর্যন্ত ছেলের জন্য মা তাঁর বান্ধবীকে বললেন। বিধানচন্দ্র ডেকে পাঠালেন। পথের পাঁচালি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবগত বিধানচন্দ্র কাহিনি শুনলেন, তারপর

নির্দেশ দিলেন—পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ছবির আর্থিক দায়ভার বহন করবেন। প্রথমেই রানা দত্তকে তাঁর চল্লিশ হাজার টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হল। ডিকে-কে নিয়ে রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এলেন সত্যজিৎ। স্বত্ব সংক্রান্ত আলোচনা সারা হল। ১৯৫৪-র ১২ এপ্রিল। প্রবল উদ্যমে শুরু হল কাজ। এতদিন সুব্রত মিত্র আর বংশী চন্দ্রগুপ্ত—দুজনের বরাদ্দ ছিল দিনে এক প্যাকেট সিগারেট, এবার সবার জন্য সামান্য হলেও কিছু পারিশ্রমিক বরাদ্দ হল। ব্যতিক্রম সত্যজিৎ, কারণ তাঁর বেতন আছে, তিনি তখনও ডি জে কিমারের চাকরি করেন।

বাধা সব যে দূর হয়ে গেল তা নয়। সরকারি আমলারা বুঝে উঠতে পারলেন না কেন বিধানচন্দ্র সিনেমা নির্মাণের জন্য টাকা বরাদ্দ করবেন। তাই এই সিনেমার মাধ্যমে যাতে সরকারি সাফল্য তুলে ধরা যায় তার জন্য নানা শর্ত আরোপ করতে শুরু করে দিলেন তাঁরা। শেষ পর্যন্ত আবার বিধানচন্দ্রকেই হস্তক্ষেপ করতে হল। আসলে তিনি দুটি কারণে পথের পাঁচালির দায় নিতে রাজি হয়েছিলেন : প্রথমত, সুকুমার রায়ের ছেলে আর উপেন্দ্রকিশোরের নাতি অর্থাভাবে ছবি নির্মাণ করতে নেমে আটকে গেছেন; আর দ্বিতীয়ত, তিনি সত্যজিৎ রায়ের মুখে দেখেছিলেন প্রচণ্ড দৃঢ়তার ছাপ। আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়েছিল তাঁর কথায়। তাই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, এই ছবি সাফল্য পাবেই। সেই বিশ্বাস থেকেই তিনি উদ্যোগ নিয়ে আমলাতান্ত্রিক বাধা দূর করে দিলেন। নিজের ইচ্ছেমতো ছবি নির্মাণে বাধা রইল না সত্যজিতের।

ছবি শেষ হল। এবার পরিবেশনা নিয়েও শুরু হল টানাপোড়েন। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের অজিত বসু এগিয়ে এলেন দায়িত্ব নিতে। ২৬ আগস্ট ১৯৫৫ মুক্তি পেল 'পথের পাঁচালি'। তারপর সৃষ্টি হল এক ইতিহাস। 'মানবতার শ্রেষ্ঠ দলিল' পথের পাঁচালি আর তার আর এক স্রষ্টার নতুন পথচলা। যে-চলায় নতুন নতুন বিস্ময় স্থাপিত হল। বাংলার সংস্কৃতি, শিল্পচর্চা বন্দিত এবং নন্দিত হল বিশ্বের প্রান্তে-প্রান্তরে। বাঙালি তার সংস্কৃতি চর্চায় খুঁজে পেল নিজস্ব এক আইকন। বিশ্বের দরবারে সুস্থ, মার্জিত, রুচিবোধসম্পন্ন শিল্পভাষা খুলে দিল নতুন এক জগৎ। কাশফুলে ভরা মাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপু আর দুর্গার মতো বিস্ময়মুগ্ধ চোখে বিশ্ব দেখল রেলগাড়ি ইঞ্জিনের ধোঁয়া উড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় তথা বিশ্ব চলচ্চিত্র, এক নতুন দিগন্তের দিকে।

তথ্যসূত্র

১। পুণ্যলতা চক্রবর্তী, *ছেলেবেলার দিনগুলি* (আনন্দ : কলকাতা, ১৯৯৭), পৃঃ ১১৮-১১৯
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মন্দিরের উপদেশ*, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ভাদ্র ১৩৩০ (কোরক, সুকুমার সংখ্যা, বারিদবরণ ঘোষের প্রবন্ধ সুকুমার রায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ২০)
৩। *দেশ*, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় গৃহীত সাক্ষাৎকার, (১৮ এপ্রিল ১৯৮৭), পৃঃ ২০
৪। *নবকল্লোল, সত্যজিৎ রায় বিশেষ সংখ্যা*, ১৯৯১, নলিনী দাশ, *সত্যজিৎ রায়ের ছেলেবেলা*, পৃঃ ২৭
৫। Satyajit Ray, *My years with Apu* (Penguin Books : 2020), p. 10
৬। Ibid, p. 11
৭। *দেশ*, ১৮ এপ্রিল ১৯৮৭, পৃঃ ২২
৮। *My years with Apu*, p. 15
৯। Ibid, p.17
১০। *দেশ*, রবি বসু, *সত্যজিতের প্রথম ছবি এবং একজন সাংবাদিক* (২৮ মার্চ ১৯৯২), পৃঃ ৩৭
১১। *দেশ*, *পৃথিবীরই একটি শ্রেষ্ঠ চিত্রসৃষ্টি*, শৌভিক (পঙ্কজভূষণ দত্ত) ১৯৫৫, উদ্ধার : রবি বসুর প্রবন্ধ, দেশ, ২৮ মার্চ ১৯৯২, পৃঃ ৩৮
১২। চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, *'পথের পাঁচালী'র নেপথ্য কাহিনী*, শারদীয় *দেশ* ১৯৮২, পৃঃ ৩১